বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ৪১ বার্ষিক সংখ্যা ১৪৩০

শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরস্পর নির্ভরশীলতা: অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনা

রুশিদান ইসলাম রহমান*

১। ভূমিকা

শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকে আত্মিক ও নৈতিক উন্নতির উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এদেশে বহুযুগ বা শতাব্দী ধরে। তবে শিক্ষা ও বিশেষত বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের বিষয়টি সামনে এসেছে সাম্প্রতিককালে। উন্নয়নের জন্য শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব আজ সারা বিশ্বে স্বীকৃত। এটা শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপকরণ নয়, বরং সার্বিক উন্নয়নের একটি অংশ। বাংলাদেশও গত কয়েক দশক ধরে শিক্ষাকে উন্নয়নের একটি লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে। শিক্ষার অগ্রগতির ফলে জনমানসে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় যার সাথে নানাবিধ সামাজিক সুফল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি কীভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও তার মাধ্যমে শ্রম আয়ের উপর নির্ভরশীল বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবনমানের অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে সে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার অবদানের প্রসঙ্গে কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনা করা হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য কীভাবে এসব অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে সেটাও মনোযোগ পাবে।

শিক্ষা অর্জন বৃদ্ধির সাথে জিডিপি প্রবৃদ্ধি কীভাবে প্রভাবিত হয় সে বিষয়ে তত্ত্বগুলো এখন সুপরিচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই প্রভাব সংক্রান্ত কিছু গবেষণাও হয়েছে। কাজেই এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য সেই বিশ্লেষণ নয়। বরং এই সম্পর্কটি কীভাবে শ্রমশক্তির কর্মনিয়োজনের মাধ্যমে কাজ করে, সেখানে কোনো ধরনের বৈষম্য বিরাজ করে কিনা এবং তার ফলাফল কী হতে পারে সেগুলো পর্যালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এসব বিষয়ে তথ্যভিত্তিক গবেষণা সাম্প্রতিককালে হয়নি। অতীতে এ ধরনের যেসব বিশ্লেষণ হয়েছে তার সাথে সাম্প্রতিক তথ্য তুলনা করে দেখা হবে যে, এসব প্রবণতা কী কী সমস্যার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কোন পথে রয়েছে। তা থেকে কিছু নীতি-কৌশল সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হবে। এ প্রবন্ধে পরবর্তী আলোচনার ধারাবাহিকতা হবে নিম্নরূপ:

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা কীভাবে ঘটতে পারে সে বিষয়ের তাত্ত্বিক পটভূমি সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে। বাংলাদেশের জন্য এ ধরনের গবেষণার কিছু ফলাফল আলোচনা করা হবে।

- বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগের উপর প্রভাবক কারণগুলো বিশ্লেষণ করে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে কিনা তার পর্যালোচনা থাকবে।

*সাবেক গবেষণা পরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

- শ্রমশক্তি, শ্রমবাজার পরিস্থিতি ও শিক্ষা অর্জনের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হবে। বিশেষ করে মনোযোগ পাবে এদেশে শ্রমশক্তির শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের উপর শিক্ষার প্রভাব এবং কর্মসংস্থানের খাত ও ধরনের সাথে শিক্ষাস্তরের সম্পর্ক।
- মজুরি ও উপার্জনে শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।
- তারপর আসবে দারিদ্র্য নিরসনে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা।
- শিক্ষিত বেকারত্ব ও তার প্রবণতা বিষয়টি পৃথকভাবে আলোচনা করা হবে।
- উপরিউক্ত আলোচনাতে নারী পুরুষের মধ্যে অর্জন যতটা সম্ভব আলাদাভাবে দেখা হবে।
- এসব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হবে উপসংহারে।

যদিও এই প্রবন্ধে শিক্ষা ও উন্নয়নের আন্তঃক্রিয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, উন্নয়নের সবদিক এই আলোচনার পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ উন্নয়নের রয়েছে বহুবিধ মাত্রা; উন্নয়নের সংজ্ঞাতে যেমন অন্তর্ভুক্ত করা হয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, তেমনি নানা ধরনের সামাজিক উন্নয়নও তার আওতায় আসে, যার কিছু কিছু দিক বর্তমান বিশ্লেষণে এসেছে।

২। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নানা দিকের অগ্রগতিতে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক ধারণা করার জন্য শুরুতেই জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষার অবদান বিষয়ে তাত্ত্বিক অবস্থান ও বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি সম্ভব হয়েছে 'অন্তউৎসারিক (endogenous) প্রবৃদ্ধি তত্ত্বের' মাধ্যমে যেখানে রোমার (1990) একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই ধরনের তত্ত্বগুলোর একটি প্রধান দিক হচ্ছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং তার পেছনে গবেষণার মাধ্যমে নতুন পণ্য ও উৎপাদন কৌশল প্রাপ্তি এবং/অথবা অন্যত্র উদ্ভাবিত প্রযুক্তির বিষয়টি প্রবৃদ্ধি মডেলের ভিতরেই অন্তর্ভুক্ত। এসবের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা করা হয়। এ ধরনের তত্ত্বে শিক্ষা অর্জনের সূচকের অন্তর্ভুক্তি পরবর্তীতে বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক গবেষণাতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাতে বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের প্রযোজ্যতাও প্রমাণিত হয়েছে। তার কিছু উদাহরণে যাওয়ার আগে অবশ্যই ব্যেকার (1964) এবং মিন্সার (1981) এর উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই দুটিতে শিক্ষায় ব্যয়ের ফলে ব্যক্তির আজীবন উপার্জনে কী প্রভাব পড়ে তার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ রয়েছে এবং তারা শিক্ষার এই ব্যয়কে বলেছেন "মানব পুঁজিতে বিনিয়োগ"। এই শব্দ গুচ্ছই সূচনা করলো যে শিক্ষাকে মানব পুঁজি হিসেবে বিবেচনা করাটাই সমীচীন। তখন সেটা অন্যান্য ভৌত পুঁজির মতোই প্রবৃদ্ধির সমীকরণে প্রবেশের যুক্তিসংগত ভিত্তি অর্জন করল।

পরবর্তীকালে "নব্য প্রবৃদ্ধি তত্ত্ব" ও তার তথ্যভিত্তিক প্রয়োগ দেখা যায় কয়েকটি বহুলালোচিত গবেষণাতে (Barros, 1993; Barro, 1991)। শিক্ষা কীভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে সেটার একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যাও প্রয়োজন। প্রথমত, উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে গবেষণা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটে

এবং তার মাধ্যমে উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তির সূচনা হয়। দ্বিতীয়ত, এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য নিম্নতর পর্যায়ের (মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক) শিক্ষা প্রয়োজন। কিছু প্রযুক্তি অধিকতর উন্নত দেশ থেকে আমদানি করা সম্ভব। কিন্তু কোন কোন প্রযুক্তি আমদানি উপযুক্ত বা লাভজনক হতে পারে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষিত জনশক্তি দরকার।

প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে এই মানব পুঁজিকে কীভাবে দেখা হবে বা পরিমাপ করা হবে এবং কোন অর্থে মানব পুঁজি ক্রমান্বয়ে বাড়া প্রয়োজন প্রবৃদ্ধি চলতে থাকার জন্য– এসব বিষয়ে কিছু মতভেদ আছে। সেগুলোর আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধের পরিসরে নেই। তবে এসব তত্ত্ব এবং তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়েছে। আর তা হচ্ছে শিক্ষাকে শুধু জনশক্তির শিক্ষা অর্জনের স্তর বা মোট বছর দিয়ে পরিমাপ করাই যথেষ্ট নয়। শিক্ষার মান ও প্রকৃত জ্ঞান অর্জনও এসব মডেলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং তথ্যভিত্তিক গবেষণাতে ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রস্থচ্ছেদ তথ্যের তুলনার মাধ্যমে যেসব গবেষণা হয়েছে সেগুলোতে প্রবৃদ্ধির উপর শিক্ষাস্তর, পরীক্ষার স্কোর ইত্যাদির ইতিবাচক প্রভাব দেখা গিয়েছে (Barros, 1993; Hamishek, & Woessmann, 2010)। একক দেশভিত্তিক বিভিন্ন সময়ের তথ্যের তুলনা ভিত্তিক গবেষণাতেও একই ধরনের উপসংহার টানা হয়েছে। যেমন, মৌরিশাস (Odit, Dooklaan, & Fauzel, 2010) ও স্পেন (Marquez-Ramos & Morelle, 2019) এর জন্য দুই গবেষণাতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। স্পেনের ক্ষেত্রে গবেষণাটিতে শিক্ষার মানের গুরুত্ব জোরালো বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য একটি গবেষণাতে (Ahmad & French, 2011) ১৯৭৩ থেকে ২০০৪ সালের কালক্রমিক তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে দেখা গিয়েছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন পন্থা গ্রহণের ফলে মধ্যমেয়াদে দেশের জিডিপির ওপর বেশি প্রভাব পড়ে। তবে এটা এজন্য হয়ে থাকতে পারে যে, ২০০৪ সাল পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার প্রসার সীমিত ছিল। আরেকটি গবেষণা (Islam, Wadud, & Islam, 2007) ১৯৭৬ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই উপসংহারে পৌঁছায় যে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষার মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক দুই দিক থেকেই ঘটেছে। তবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পিছনে একটি কারণ হতে পারে এই যে, এই গবেষণাতে শিক্ষার পরিমাপ হিসেবে নেওয়া হয়েছে সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয়। শিক্ষাতে জিডিপির শতাংশ হিসেবে ব্যয় একই থাকলেও জিডিপি বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষাতে মোট ব্যয় বাড়বে। কাজেই দুটোর গতি একই দিকে হবে এবং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল প্রতীয়মান হবে। সুতরাং সরাসরি শিক্ষার অর্জনে অগ্রগতি ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্পর্ক (অন্যান্য নিয়ামক অন্তর্ভুক্ত রেখে) বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক বছরগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর শিক্ষার প্রভাব পুন:পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে সাম্প্রতিক সময়ে আরও গুরুত্বের সাথে দেখা প্রয়োজন কারণ এদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে পুঁজিঘন মেগা প্রকল্প, বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, এমনকি বেসরকারি খাতেও বিদেশি নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান নিয়োজনের ফলে দেশজ শ্রমশক্তির নিয়োগ ও তাদের শিক্ষার গুরুত্ব হ্রাস পেতে পারে। এমন উদ্ধৃত্ত শ্রমের দেশে সেগুলো হতে পারে আত্মঘাতী কৌশল। কাজেই এসব নিয়ামক অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরায়নে শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী আরও বৃদ্ধি পেতে পারে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রসারের মধ্য দিয়ে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে যেসব প্রযুক্তিগত বিকাশ স্থান পাবে সেগুলোর ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি উচ্চ স্তরের ও উন্নতমানের শিক্ষার প্রয়োজন হবে। এরূপ দক্ষ ও শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের

সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি হ্রাস পাবে স্বল্প শিক্ষিত, নিম্নদক্ষতা প্রয়োজন তেমন কর্মসংস্থান (Rahman, 2020)। সেগুলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রকৌশল দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সেই পর্যায়ের প্রযুক্তি বিপ্লবের সময়ে প্রবৃদ্ধি তত্ত্বে শিক্ষার ভূমিকা পরিবর্তিতরূপে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হবে। তথ্যভিত্তিক গবেষণাতেও শিক্ষার সূচক চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপের জন্য পুনর্ভাবনা শুরু করতে হবে। সেই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরায়নের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে এখন থেকে প্রয়োজন হবে দেশে একটি শিক্ষা বিপ্লব।

৩। শ্রমশক্তি, শ্রমবাজার পরিস্থিতি ও শিক্ষার্জনের আন্তঃক্রিয়া

শ্রমশক্তি ও শিক্ষা অর্জনের আলোচনাতে যাওয়ার আগে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে গত তিন দশকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়েছে। এই ত্বরায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে শিল্প ও সেবা খাতের প্রসার এবং এসব খাতে প্রবৃদ্ধির ত্বরায়ন। শিল্প ও সেবা খাতে অধিকতর শিক্ষিত শ্রমশক্তির ব্যবহার হয়। কাজেই শিক্ষার প্রসার এবং শিল্প ও সেবা খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি এগুলো পরস্পর নির্ভরশীল বলা যায়। এসব বিষয়ে গত দুই দশকের তথ্য- উপাত্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা থেকে এসব আন্তঃক্রিয়ার স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে।

এখানে প্রথমে তুলে ধরা হয়েছে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির শিক্ষা অর্জনে অগ্রগতির ধারা। তারপর জিডিপি ও শ্রমশক্তির কাঠামো পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে তার সাথে শিক্ষার্জনের প্রবণতার সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আলোচনা করা হবে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বিশাল অংশই অনানুষ্ঠানিক ধরনের এবং সেটা কমিয়ে আনুষ্ঠানিক ধরনের কর্মসংস্থান বাড়ানোটা কাঙ্ক্ষিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষা কোনো ভূমিকা রাখতে পারে কিনা সেটা আলোচনা করা হবে।

৩.১। বাংলাদেশে শ্রমশক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৯৯০ এর দশক থেকেই এদেশের সরকার শিক্ষার প্রসারের জন্য বিনিয়োগ এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। সুতরাং এর সুফল হিসেবে পরের দশকগুলোতে শ্রমশক্তির শিক্ষা অর্জন বৃদ্ধি প্রত্যাশিত। ১৯৯৬ থেকে ২০১৬-১৭ সময়কালের জন্য শ্রমশক্তি জরিপ থেকে প্রাপ্ত এতদসংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে সারণি ১-এ। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত তথ্য তুলনা করলে দেখা যায় যে, এই দেড় দশকে একেবারে শিক্ষা পায়নি এমন শ্রমশক্তির অংশ হ্রাস পেয়েছে, সেটা পূরণ হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিতের অংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে। পরবর্তী সাত বছরে (২০১০ থেকে ২০১৭) এই প্রবণতা দ্রুততর হয়েছে। কোনো শিক্ষা অর্জন নেই এমন অংশ এই সাত বছরে আগের ১৪ বছরে যে পার্থক্য ঘটেছিল, তার চেয়েও বেশি হ্রাস পেয়েছে। এই দুই সময়কালে পার্থক্য ছিল ৬.৫ ও ৮.২ শতকরা পয়েন্ট। এই সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষিতদের অংশ তো বেড়েছেই, সেই সাথে বেড়েছে স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের অংশ। অর্থাৎ ১৯৯০ এর দশক থেকে প্রাইমারি পর্যায়ে ভর্তি হার বৃদ্ধির যে প্রবণতা শুরু হয়েছিল, সেখান থেকে স্নাতক পর্যায়ে এসে সেটা পৌঁছাতে এই আড়াই দশক লেগেছে। তবে স্নাতক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিতদের অংশ এখনও তত বেশি নয়।

সারণি ১: বাংলাদেশের শ্রমশক্তির শিক্ষাস্তর: ১৯৯৬ থেকে ২০১৭

শিক্ষাস্তর	শ্রমশক্তির (১৯৯৬, ২০০০, ২০১০)/কর্মনিয়োজিত শ্রমশক্তির (২০০৬, ২০১৭) শতাংশ				
	১৯৯৬	২০০০	২০০৬	২০১০	২০১৭
কোনো শিক্ষা নেই	৪৬.৬	৪৮.১	৪১.১	৪০.১	৩১.৯
প্রাইমারি পর্যন্ত	২৩.২	২৫.০	২৪.১	২২.৮	২৫.৮
এসএসসি পর্যন্ত (২০০৬ থেকে ২০১৭)	১৫.৬ (এস এস সি এর নিচে)	২৩.৭ (এইচ এস সি)	২৬.৫	২৯.৫	৩০.৮
এইচএসসি	৮.৯ (এসএসসি+এইচ এস সি)		৩.৫	৩.৭	৬.০
স্নাতক ও তার উর্ধ্বে	৩.৬	৩.২	৪.৬	৩.৭	৫.৩
অন্যান্য	২.০		০.২	০.২	০.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট, বিভিন্ন বছর।

এই চিত্র থেকে ধারণা করা যায় যে, এই দুই দশকে শিক্ষিত শ্রমশক্তির অংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনীতির খাতগুলোতে এমন পরিবর্তন হয়েছে যে আধুনিক শিল্প ও সেবা খাতে শ্রমের নিয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং তা কৃষিখাতে হ্রাস পেয়েছে। অর্থনীতিতে এই তিন খাতের অবদানও সেই সাথে পরিবর্তিত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। সেসব বিষয়ে তথ্য তুলে ধরে সেগুলো শ্রমশক্তির শিক্ষা অর্জনের প্রবণতার সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা দেখা যাক।

৩.২। জিডিপি ও কর্মসংস্থানের কাঠামো এবং শিক্ষা[১]

জিডিপির খাতভিত্তিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা দেখা যাচ্ছে সারণি ২ থেকে। ২০০০ সালে জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল ২৫.৫ শতাংশ। ধারাবাহিকভাবে তা হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে দাঁড়িয়েছে ১৪.৭ শতাংশে। এই সময়ে শিল্প খাতের অবদান ২৫.২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২.৫ শতাংশ। সেবা খাতে সেটা ৪৯.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫২.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সেবা খাতের এই অবদান অবশ্য ক্রমিকভাবে বাড়েনি, বিভিন্ন সময়কালে ওঠানামা ছিল।

[১]পরবর্তী সব আলোচনা ও সারণি বাংলাদেশের তথ্যভিত্তিক। পুনরুক্তি এড়ানোর জন্য সব সারণির শিরোনামে বাংলাদেশ শব্দটি যোগ করা হয়নি।

সারণি ২: জিডিপি ও কর্ম নিয়োজন এর খাতভিত্তিক কাঠামোতে পরিবর্তন: ২০০০ থেকে ২০১৭

খাত	কর্মনিয়োজিতদের শতাংশ				
	২০০০	২০০৬	২০১০	২০১৩	২০১৭
কৃষি	৫০.৮	৪৮.১	৪৭.৬	৪৫.১	৪০.৬
শিল্প	১২.৪	১৪.২	১৭.২	২০.১	২০.০
উৎপাদন শিল্প	৯.৬	১১.০	২.৪	১৬.৪	১৪.৪
নির্মাণ	২.৮	৩.২	৪.৮	৩.৭	৫.৬
সেবা	৩৬.১	৩৭.৪	৩৫.৪	৩৪.১	৩৯.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
খাত	জিডিপির শতাংশ*				
	২০০০	২০০৬	২০১০	২০১৩	২০১৭
কৃষি	২৫.৫	১৯.০	১৮.৪	১৬.৮	১৪.৭
শিল্প	২৫.২	২৫.৪	২৬.৭	২৯.০	৩২.৫
উৎপাদন শিল্প	১৭.৪	১৮.৯	২০.১	২২.১	২৫.১
নির্মাণ	৭.৮	৬.৫	৬.৬	৬.৯	৭.৪
সেবা	৪৯.৩	৫৫.৬	৫৪.৯	৫৪.২	৫২.৮
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

টীকা: উৎপাদন শিল্প ও নির্মাণ একত্রে "শিল্প খাত"; অর্থ বছরের জন্য।

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট, বিভিন্ন বছর, নিচের অংশ: MoF: Bangladesh Economic Review (বিভিন্ন বছর)|

একই সারণির উপরের অংশ থেকে এই সময়ে কর্মসংস্থানের কাঠামোর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ২০০০ ও ২০১৭ এই দুই সালে মোট কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান ছিল যথাক্রমে ৫১.৮ ও ৪২.৭ শতাংশ, শিল্প খাতের অবদান ছিল ১২.৪ ও ২০.১ শতাংশ এবং সেবা খাতে সেটা ছিল ৩৬.১ ও ৩৭.০ শতাংশ অর্থাৎ এসব খাতে কর্মসংস্থানের ও জিডিপির অংশ মোটামুটি সমান্তরালভাবেই পরিবর্তিত হয়েছে।

শিল্প ও সেবা খাতে শিক্ষিত শ্রমের চাহিদা কৃষির তুলনায় বেশি হবে কারণ এগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। ২০০০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে শ্রমশক্তির শিক্ষার্জন বেড়েছে, যা ইত:পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে (সারণি ১)। শিল্প ও সেবা খাত শিক্ষিত শ্রমের ভিত্তিতে প্রসার লাভ করছে কিনা তা আরও সরাসরি অনুধাবনের জন্য বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শিক্ষা অর্জনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে সারণি ৩-এ। সারণিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির তুলনায় শিল্প ও সেবা খাতে নিয়োজিতদের মধ্যে শিক্ষিতদের অংশ অনেক বেশি। কৃষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৪৪.৮ শতাংশেরই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন নেই। শিল্প ও সেবা খাতে শিক্ষা অর্জনহীন নিয়োজিত ব্যক্তি হচ্ছে যথাক্রমে ২৩.৯ ও ২২.৬ শতাংশ, অর্থাৎ কৃষির তুলনায় এটা প্রায় অর্ধেক।

সারণি ৩: বিভিন্ন খাতে কর্মনিয়োজিতদের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বণ্টন (%)

শিক্ষাস্তর	কৃষি	শিল্প	সেবা
কোনো শিক্ষা নেই	৪৪.৮	২৩.৯	২২.৬
প্রাথমিক	২৫.৯	৩১.৯	২২.৬
মাধ্যমিক	২৬.৩	২৪.৮	৩৩.৩
উচ্চ মাধ্যমিক	২.২	৫.২	১০.৩
স্নাতক	০.৭	৪.০	১০.৭
অন্যান্য	০.১	০.২	০.০
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭।

উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের অংশ কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে যথাক্রমে ২.৯, ৯.২ ও ২১.০ শতাংশ। কাজেই শিক্ষিতদের কর্মনিয়োজনের মাধ্যমে অর্থনীতির কাঠামোতে পরিবর্তন ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি ত্বরায়নের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে। তবে এই পথে আরও অনেক দূর যেতে হবে। যেমন: শিল্প খাতে এখনও মাত্র ৯.২ শতাংশ শ্রমশক্তি মাধ্যমিকের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষিত।

কর্মসংস্থানের কাঠামো এবং তার পরিবর্তনের আলোচনাতে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ আর তা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক ধরনের নিয়োজনের অংশ। এটি এখন সুবিদিত যে, এদেশে কর্মসংস্থানের বিশাল অংশই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক খাতে (২০১৬-১৭ সালে তা ছিল ৮৫ শতাংশ)। গত দেড় দশকে এই অংশ হ্রাস পায়নি (পরিশিষ্ট সারণি ১)।

শিক্ষার একটি বড় ভূমিকা রয়েছে আনুষ্ঠানিক নিয়োজনের ক্ষেত্রে। শিক্ষাস্তর অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক নিয়োজনের হার দেখানো হলো সারণি ৪-এ। শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে এই হার ক্রমিকভাবে বাড়ছে। স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের প্রায় অর্ধেক (৪৮.৩ শতাংশ) আনুষ্ঠানিক নিয়োজনে রয়েছে। কাজেই উচ্চ শিক্ষা সমাপনের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক নিয়োজনের অংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। এই প্রক্রিয়া ঘটে কর্মসংস্থানের খাতভিত্তিক পরিবর্তনের সাথে সাথে, যেটা আবার শিক্ষাস্তরের সাথে সম্পর্কিত।

সারণি ৪: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজনের হার
(সেই শিক্ষাস্তরে মোট কর্মনিয়োজিতদের শতাংশ)

শিক্ষাস্তর	আনুষ্ঠানিক নিয়োজনের হার (সেই শিক্ষাস্তরে মোট কর্মনিয়োজিতদের শতাংশ)		
	নারী ও পুরুষ মোট	নারী	পুরুষ
কোনো শিক্ষা অর্জন নেই	৫.৬	৪.০	৬.৫
প্রাইমারি পর্যন্ত	১০.৮	৫.৫	১৩.০
এসএসসি পর্যন্ত	১৯.১	৯.১	২৩.৭
এইচএসসি পর্যন্ত	৩২.০	২০.২	৩৫.৪
স্নাতক তদুর্ধ্ব	৪৮.৩	৪৯.৪	৪৮.০
অন্যান্য	১১.৩	২.৯	১২.০
মোট	১৪.৯	৮.২	১৭.৯

উৎস: বিবিএস (শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭)।

৪। শিক্ষা, শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা, আয় ও দারিদ্র্য হ্রাস

শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার উপর শিক্ষার সুপ্রভাব থাকবে এটা অনেকটা স্বত:সিদ্ধের মতোই। উচ্চ শিক্ষিত ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে এটা ঘটে তাদের নতুন উৎপাদনপন্থা চিহ্নিত করা বা আবিষ্কার করার মাধ্যমে। আমদানিকৃত প্রযুক্তি নিজ দেশে ব্যবহার করার জন্যও শিক্ষা প্রয়োজন। তবে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষাও শ্রমশক্তিকে কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতার উপর শিক্ষার প্রভাব বোঝা যায় মজুরি বা উপার্জনের উপরে শিক্ষার প্রভাবের মাধ্যমে। মজুরি/উপার্জন/বেতন তো উৎপাদনশীলতারই প্রতিফলন ঘটায়, যদিও তাতে অন্যান্য প্রভাবও থাকতে পারে। অর্থমিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেতন বা মজুরি ও উপার্জনের উপর বাংলাদেশে শিক্ষার প্রভাব পর্যালোচনা করা যায়। এটা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা সব স্তরের শিক্ষার জন্যই প্রযোজ্য। আর শিক্ষাস্তর বাড়ার সাথে সাথে উপার্জন ক্রমান্বয়েই বাড়ে।

শ্রমশক্তি জরিপ থেকে প্রাপ্ত মজুরি/বেতন থেকে উপার্জনের নিয়ামকগুলোর বিশ্লেষণ থেকে এখানে কিছু তথ্য পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ২০০৩ ও ২০১৭ সালের তথ্য থেকে প্রাপ্ত দুটি নির্ভরণ সমীকরণের ফল থেকে প্রাপ্ত উপসংহারগুলো এখানে পর্যালোচনা করা হচ্ছে (Rahman, 2007; Rahman & Islam, 2019)। ২০০৩ সালের জন্য বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে, দৈনিক মজুরি/বেতনের উপর কার্যকর উপকরণগুলোর প্রভাব। সেখানে অন্য সব বৈশিষ্ট্য একই রকম থাকলেও শিক্ষার্জন বৃদ্ধির সাথে সাথে মজুরি/বেতন বাড়ছে। এই ইতিবাচক প্রভাবের পরিমাণ গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি এবং দুই ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানগত দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। দক্ষতা অর্জন থাকলে সেটির প্রভাবও ইতিবাচক এবং গ্রামের তুলনায় শহরে উচ্চতর (Rahman, 2007)। স্বনিয়োজন থেকে আয়ের উপর এই প্রভাব পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানেও শিক্ষার প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইতিবাচক। শহরের ক্ষেত্রে এই প্রভাব গ্রামের তুলনায় উচ্চতর।

২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপে দৈনিক মজুরি/বেতন সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। সেখানে আছে এই উৎস থেকে মাসিক আয়। শিক্ষার প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য শিল্প খাতে এই আয়ের উপর বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে একটি নির্ভরণ সমীকরণে (Rahman & Islam, 2019)। সেখানে দেখা যায়, শিল্পখাতে মজুরি/বেতনের উপার্জনের উপর শিক্ষাস্তর বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। খানা আয়/ব্যয় জরিপ থেকে ২০১৬ সালে শিক্ষার সাথে সাথে খানার গড় আয় এর সম্পর্ক দেখা যায় (সারণি ৫)। প্রাথমিক এর উপরের স্তরের শিক্ষাস্তরগুলোতে ক্রমান্বয়ে গড় আয় বেড়েছে।

সারণি ৫: খানা প্রধানের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী খানার গড় আয়

শিক্ষাস্তর	মাসিক গড় আয় (টাকা), ২০১৬-১৭		
	জাতীয়	গ্রাম	শহর
কোনো শিক্ষা নেই	৩,৭৭২	২,৬৯৯	৭,২৪২
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি	৩,৩৬৬	২,৮৮৪	৫,০০২
ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি	৪,০৩৬	৩,৩৭৩	৫,৮১৪
এসএসসি/এইচএসসি	৫,১৯৭	৪,২৩২	৬,৭৩৪
গ্র্যাজুয়েট (সমতুল্য)	৭,৯৯৮	৫,৩৩৫	১০,৫৪৩
স্নাতকোত্তর	৯,৪১৮	৭,০৫৫	১১,১৩৮
ডাক্তার	৮,৫৪১	৫,১২৪	১০,৯৬৫
ইঞ্জিনিয়ার	১১,৯৮৬	১০,৫০২	১২,৭২১
সর্বস্তরের গড়	৪,০৬২	৩,২৬৯	৬,১৩২

উৎস: বিবিএস, খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১৬-১৭। এসব তথ্য যেসব পরিবার প্রধান পুরুষ তাদের জন্য। নারী খানা প্রধানের ক্ষেত্রে তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হয়নি, কারণ তারা অনুপস্থিত পুরুষ খানা সদস্যের আয় পারিবারিক আয় হিসেবে যোগ করে থাকে, কাজেই প্রকৃত তুলনা তা থেকে পাওয়া যায় না।

শিক্ষা ও দারিদ্র্য হ্রাস

আয়ের উপর শিক্ষার এই ইতিবাচক প্রভাব থেকে এটা প্রত্যাশা করা যায় যে, সেটা পরিবারের দারিদ্র্য হ্রাসেও সহায়ক হবে। শিক্ষার ক্রমপ্রসারের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য হার অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। এই দারিদ্র্য হ্রাস কীভাবে ঘটেছে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের চালিকাশক্তিগুলো কী কী সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে শিক্ষার ভূমিকাটি মনোযোগ পেয়েছে (রহমান, রু. ই. ও অন্যান্য, ২০২২)।

প্রথমে উল্লেখ করা যায় যে, ২০০০ সালের শ্রমশক্তি জরিপের মূল তথ্যভাণ্ডার থেকে বিশ্লেষণ করে রহমান ও অন্যান্য (2003) দেখিয়েছেন যে, কোনো পরিবার দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা শিক্ষা অর্জন বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায় (নির্ভরণ সমীকরণে তার সহগ পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ)। শহরাঞ্চলে শিক্ষার এই প্রভাব গ্রামের তুলনায় উচ্চতর, যা সহজবোধগম্য। শহরাঞ্চলে শিক্ষিতদের আয়ের সুযোগ গ্রামের তুলনায় বেশি।

বিশ্বব্যাংক (2008) একই ধরনের উপসংহারে পৌঁছেছে খানা-আয় ব্যয় জরিপের তথ্য থেকে। ২০০৫,২০১০ ও ২০১৬ এ তিনটি সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য তুলনা করে বিশ্বব্যাংক (2019) দেখিয়েছে যে, দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। সেখানে বিভক্তিকরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, প্রজনন হার সংক্রান্ত পরিবর্তন, শিক্ষা অর্জন এবং সম্পদ বৃদ্ধি মিলে এই দশ বছরে ভোগব্যয় দ (যা দারিদ্র্যের প্রতিফলন) বৃদ্ধির অর্ধেক অংশ ব্যাখ্যা করতে পারে। গ্রামে ও শহরে এগুলোর প্রভাব প্রায় একই ধরনের বলে দেখা যায়। এই তিনটির মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব দ্বিতীয় অবস্থানে।

সেন (2019) দেখিয়েছেন যে, ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের ৯০ শতাংশই ঘটে গ্রামে। দারিদ্র্য হ্রাসের এই অর্জন অকৃষি খাতের প্রসারের মাধ্যমেই ব্যাপকভাবে ঘটেছে। এই প্রক্রিয়াটি দেখা গিয়েছে নারী পুরুষ সবার ক্ষেত্রে এবং উচ্চতর শিক্ষা অর্জন যাদের তাদের ক্ষেত্রে।

শিক্ষা অর্জন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের এই প্রক্রিয়াতে সাফল্য অব্যাহত রাখতে পারলে এ দেশ ক্রমান্বয়ে দারিদ্র্য একেবারে নিঃশেষ করার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসের গতি কী ধরনের তার আরেকটু গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বিরাজ করলে দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার সাফল্য টেকসই নাও হতে পারে। পরবর্তী আলোচনাতে তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হবে। তার আগে এখানে ২০০০ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দারিদ্র্য হ্রাসে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিতদের সাফল্যের গতি সম্পর্কিত সরাসরি তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬ এই তথ্য দেখাচ্ছে। এই সারণিতে ১৯৯৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রতি শিক্ষাস্তরে কতটা (শতকরা পয়েন্ট) বা কী হারে (ভিত্তি বছরের শতাংশ হিসেবে) দারিদ্র্য হ্রাস হয়েছে সেটা হিসেব করা হয়েছে বিভিন্ন বছরের খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে। ১৯৯৬ ও ২০০০ সালের তথ্যের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব ক্রমিকভাবে হয়নি। বরং মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের মধ্যে দারিদ্র্য বেড়েছে, যা একেবারেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো এই জরিপে নতুন পদ্ধতি চালু হয়েছিল বিধায় এ বছরের তথ্য পরের পর্যায়ের জরিপগুলোর সাথে তুলনীয় নাও হতে পারে। আর এই পাঁচ বছরে দারিদ্র্য হ্রাস ছিল সামান্য। তাই পরবর্তী আলোচনাতে এর পরের সব জরিপের তথ্য তুলনা করা হয়েছে।

সারণি ৬: খানা প্রধানের শিক্ষাস্তর অনুযায়ী দারিদ্র্য হারের পরিবর্তন (শতকরা পয়েন্ট)

শিক্ষা	১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল	২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল	২০০৫ সাল থেকে ২০১০ সাল	২০১০ সাল থেকে ২০১৬ সাল
কোনো শিক্ষা নেই	১.৪	৮.৪	১১.৯	১৩.০
প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি	৯.৪	৩.৬	১.৮	১০.৬
পঞ্চম-নবম শ্রেণি	১.৯	৬.৮	৬.৪	৬.১
মাধ্যমিক ও তার উপরে	-১.৯	৫.৮	১.৮	০.৯
ভিত্তি সালের কত শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস				
কোনো শিক্ষা নেই	২.২	১৩.৩	২১.৭	৩০.৪
প্রথম-চতুর্থ শ্রেণি	১৮.৬	৮.৭	৪.৮	২৯.৭
পঞ্চম-নবম শ্রেণি	৫.০	১৯.০	২২.১	২৭.০
মাধ্যমিক ও তার উপরে	-১৪.৪	৩৮.৪	১৯.৩	১২.০

উৎসঃ বিবিএস: খানা আয়-ব্যয় জরিপ (বিভিন্ন বছর)।

এই তুলনা থেকে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষিত খানা প্রধানদের পরিবারে ২০০০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ও হার অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল ৩৮.৪

শতাংশ। স্বল্প শিক্ষাস্তরের পরিবারগুলোর তুলনায় তা অনেক বেশি। তবে পরবর্তী বছরগুলোতে এই হার ক্রমিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালে এই শ্রেণির তুলনায় কম শিক্ষিত পরিবারগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ও পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই পুরো ১৬ বছর সময়ে একেবারে শিক্ষা অর্জন নেই এমন পরিবারগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ধারা লক্ষ করা গেছে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ক্ষেত্রে, এরূপ শিক্ষিত পরিবারে দারিদ্র্য হ্রাস দ্রুততর হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার প্রভাব আলোচনাতে তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ওসমানী ও লতিফ (2013) দুটি বছরের তুলনা করেছেন। সেখানে ২০০০ ও ২০১০ সালের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সেটিতে ২০১০ এর তথ্যের উৎস ভিন্ন। এই সময়ে মাধ্যমিকের উপরের স্তরের শিক্ষিতদের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত হারে দারিদ্র্য হ্রাস ঘটতে দেখা গিয়েছে। সারণি ৫ এর তথ্যের ক্ষেত্রেও ২০০০ ও ২০১০ এর তুলনা করলে সর্বোচ্চ শিক্ষিত শ্রেণিতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার সর্বোচ্চ দাঁড়ায়। তবে জরিপের অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য তুলনাই অধিকতর যুক্তিসংগত।

সারণি ৬ এর ভিত্তিতে যে উপসংহার পাওয়া গিয়েছে– শিক্ষিত খানা প্রধানদের পরিবারে দারিদ্র্য হ্রাস শ্লথ হয়েছে, কোনো শিক্ষা নেই এমন পরিবারে সেটা ত্বরান্বিত হয়েছে, তা কিন্তু এক অশনি সংকেত হিসেবেই বিবেচ্য। এটা প্রত্যাশার তুলনায় বিপরীত ধরনের চিত্র দিচ্ছে। কাজেই কেন এটা হচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ করা জরুরি।

আশঙ্কা করা যায় যে, এখানে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুলো কাজ করছে:

১) শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য কাজ করছে (পরবর্তী উপ-অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য), ফলে দরিদ্র পরিবারের উচ্চতর শিক্ষাস্তরের তরুণরা মানসম্মত শিক্ষা পাচ্ছে না। তার ফলে দরিদ্র পরিবারে উপার্জনকারীরা শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আয় বৃদ্ধি করতে পারছে না;

২) দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত তরুণরা বেকারত্বে ভুগছে;

৩) দরিদ্র পরিবারের শিক্ষিত নারী কর্ম নিয়োজনে অংশ নিতে পারছে না।

তাছাড়া আয়-ব্যয় জরিপে মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষিতদের একটি শ্রেণিতে রাখা হয়েছে। সেখানে এমন হতে পারে যে দরিদ্র পরিবারে উচ্চতর শিক্ষিতদের অংশ বাড়ছে না। ফলে এই শ্রেণিতে দারিদ্র্য হ্রাস কমছে। শুধু মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উপার্জন বাড়ার সম্ভাবনা সীমিত এবং তা দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার সুফল শ্লথ হওয়ার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে একই স্তরের শিক্ষা থেকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বিরাজ করলে উন্নয়নের গতিতে শিক্ষার প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। শিক্ষার প্রসার বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা, ধনী বা আগে থেকেই যেসব পরিবারে শিক্ষা এবং

সম্পদ বেশি তাদের মধ্যে সীমিত হলে শিক্ষিত শ্রমশক্তির সরবরাহ তত দ্রুত বাড়বে না। আরও ক্ষতিকর দিক হচ্ছে যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলে সেটা দেশের আয়-বৈষম্য আরও প্রকট করবে। তার পরবর্তী ধাপে এর ফলে দারিদ্র্য হ্রাস শ্লথ হবে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, দারিদ্র্য হ্রাসের উপর ক্ষতিকর প্রভাবের দিক থেকে আয়-বৈষম্যের তুলনায় শিক্ষা অর্জনে বৈষম্য বেশি গুরুতর। কাজেই এদেশে শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে বৈষম্য আছে কিনা বা তার ধরন এগুলোর পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক স্তরে ভর্তির পর থেকেই ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্যের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিম্ন আয়ের পরিবারে নানা কারণে ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ঝরে পড়ে এবং এমন পরিবারগুলোতে স্কুলগামীতা কমে আসে। খানা আয় ব্যয় জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র ও দরিদ্র নয় এমন পরিবারে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সীদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হার যথাক্রমে ০.৮ ও ১৪.২ শতাংশ। ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সীদের মধ্যে তা যথাক্রমে ৭৪.৮ ও ৮৫.৮ শতাংশ (HIES, BBS, 2016)।

এক্ষেত্রে পার্থক্য গ্রামের তুলনায় শহরে বেশি। তার কারণ এই যে, শহরে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ বেশি। উপরের তথ্য খানা আয়-ব্যয় জরিপ থেকে নেওয়া। সেখানে তার উপরের বয়সীদের জন্য বা আরও বেশি আয় শ্রেণিতে ভাগ করে তথ্য দেওয়া নেই। এই লেখকের একটি গবেষণা (2016) থেকে দেখা গিয়েছে, ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের জন্য সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ (চারটি শ্রেণি বিভাগের মধ্যে) আয়ের পরিবারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিহার যথাক্রমে ১৪.২ ও ০.৮ শতাংশ। নিম্নতম ও উচ্চতম আয় শ্রেণিতে যথাক্রমে ৪.৪ শতাংশ ও ৪১.৪ শতাংশ এসএসসি ও তদূর্ধ্ব স্তরের শিক্ষা পেয়েছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যেও ১৮ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে বড় পার্থক্য বিরাজ করছে, যদিও এর চেয়ে কম বয়সীদের ক্ষেত্রে ভর্তি হারে গ্রাম এগিয়ে রয়েছে। তার কয়েকটি কারণ রয়েছে: গ্রামে স্কুল শিক্ষার নিম্নমানের জন্য তারা উচ্চ শিক্ষাতে যেতে পারছে না, এবং/অথবা দারিদ্র্যের কারণে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দূরত্বের কারণে যেতে পারছে না।

আর একটি গবেষণাতে (Rahman, 2006) নমুনা পরিবারগুলোকে আরও বেশি সংখ্যক আয় শ্রেণিতে ভাগ করে ৮ থেকে ১২ বছর এবং ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য ভর্তিহার এর তথ্য দেওয়া হয়েছে। সেখানে ভর্তিহার নিম্নতর আয়শ্রেণিগুলোতে একেবারে ক্রমিকভাবে হ্রাস পায়। এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের হার সর্বোচ্চ আয়শ্রেণির তুলনায় সর্বনিম্ন (চরম দরিদ্র) আয় শ্রেণিতে মাত্র ১০ শতাংশ।

ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ভর্তি হার বিবেচনায় মেয়েরা অগ্রসর অবস্থানে আছে। কিন্তু ১৫ বছরের বেশি বয়সীদের ভর্তি হারে তারা পশ্চাৎপদ অবস্থানে আছে (সারণি ৮)। অর্থাৎ নারীর এসএসসি বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনের সম্ভাবনা পুরুষের তুলনায় কম।

সারণি ৭: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বণ্টন (শতকরা)

শিক্ষাস্তর	পাঁচ ও তদূর্ধ্ব বয়সী (%)		১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সের যারা উপার্জনমূলক কর্মে নিয়োজিত (%)	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
কেনো শিক্ষা নেই	২৭.৯	৩৩.২	২৯.৮	৩৬.৪
প্রাথমিক	২৩.০	২১.৭	২৬.৫	২৪.২
মাধ্যমিক	৩৩.৬	৩৬.৪	৩০.৪	৩১.৭
উচ্চ মাধ্যমিক	৯.০	৬.০	৬.৭	৪.৩
স্নাতক	৫.৮	২.৬	৬.১	৩.৪
অন্যান্য	০.৬	০.২	০.৪	০.১
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭।

সারণি ৮: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি রয়েছে কিনা সে বিষয়ে নারী-পুরুষ পার্থক্য
(১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের শতকরা কতভাগ)

ভর্তি সংক্রান্ত পরিস্থিতি	পুরুষ	নারী	মোট
এখন প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে	১২.৬	৯.৬	১১.১
অতীতে গিয়েছিল, এখন যাচ্ছে না	৬০.৭	৫৮.৫	৫৯.৬
অতীতেও যায়নি, এখনও যাচ্ছে না	২৬.৭	৩১.৯	২৯.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭।

সারণি ৭ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো শিক্ষা নেই এমন নারীর অংশ (পাঁচ ও তদূর্ধ্ব বয়সী) পুরুষের ক্ষেত্রে এই অংশের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক শিক্ষিত-এর শতাংশ পুরুষ ও নারীর মধ্যে ৫.৮ ও ২.৬।

আরেকটি অর্থমিতিক বিশ্লেষণে বিভিন্ন বয়সী ছেলেমেয়েরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি আছে কিনা তার নিয়ামকগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে (Rahman, 2016)। এসব বিশ্লেষণ থেকে নিম্নোক্ত ধরনের বৈষম্য প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

ক) পরিবারের আয়স্তরের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে সব বয়সের মেয়েদের ভর্তি হারে।

খ) পরিবার প্রধান ও তার স্ত্রীর শিক্ষার প্রভাবও ইতিবাচক। তা দুটি কারণে ঘটছে। পরিবার প্রধানের শিক্ষা বেশি হলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বেশি হয়। শিক্ষিত পরিবার প্রধান এবং তার স্ত্রী দুজনেই ছেলেমেয়েদের স্কুলের পাঠ রপ্ত করতে সহায়তা করতে পারে। গ্রামের ৮-১০ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রভাব পরিবার প্রধানের প্রভাবের তুলনায় শক্তিশালী (বহুচলক সমীকরণে স্ত্রীর শিক্ষার সহগ মান অনেক বেশি)।

গ) পরিবারের সম্পদের প্রভাব ইতিবাচক।

ঘ) গ্রামের তুলনায় শহরে ভর্তিহার বেশি।

ঙ) মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ভর্তিহার বেশি।

চ) যেসব ছেলেমেয়ে বিবাহিত তাদের ভর্তিহার নিম্নতর।

এসব বৈষম্য কমিয়ে আনার জন্য সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন হবে। অতীতে বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে নিম্ন আয় পরিবারেও ৬ থেকে ১০ বছর বয়সীদের ভর্তিহার বেড়েছে। তবে আরও নীতি কার্যক্রম প্রয়োজন হবে বিরাজমান বৈষম্য বৃদ্ধিকারী ধারাগুলোকে স্তিমিত বা বিপরীতমুখী করার জন্য।

উপরের তথ্যগুলো শিক্ষা অর্জনে বৈষম্যের সংখ্যাগত তথ্য দিচ্ছে। সেই সাথে শিক্ষার মান ও প্রকৃত শিক্ষা অর্জনও নিম্ন আয় পরিবারের জন্য নিম্নতর হতে পারে। তার কারণ তারা গ্রামের ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কম সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন স্কুলে পড়ে, গৃহশিক্ষকের সহায়তা নেবার মতো ব্যয় করতে পারে না। পিতামাতার শিক্ষাস্তরও এ ধরনের পরিবারে কম। ফলে তারাও যথাযথ সহায়তা দিতে অসমর্থ। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আয় বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসে ব্যাঘাত ঘটায়। আয় বা সম্পদ বৈষম্যের চেয়েও শিক্ষা অর্জনে বৈষম্য আরও বেশি ক্ষতিকর প্রভাব রাখে দারিদ্র্য হ্রাসের ওপর।

সাম্প্রতিককালে ব্যানারজি ও দুফলো (2011) তাদের লেখাতে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যের বিষয়টি আলোচনার সম্মুখভাগে এনেছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাতে নিম্ন আয়ের পরিবারের ছাত্রছাত্রীরা, তাদের মতে, বলতে গেলে কিছুই পায় না। তাদের মতে, উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষাব্যবস্থা দুটি মৌলিক লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়, যেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকের জন্য ন্যুনতম দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীর প্রতিভার দিকগুলো খুঁজে বের করা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটি প্রযোজ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে শহর-গ্রামের বৈষম্য

উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশে শহরের তুলনায় গ্রামে সুযোগ-সুবিধা অপেক্ষাকৃত কম থাকে কারণ নগরায়ণের প্রাথমিক পর্যায়ে সচেতনভাবেই তা করা হয়ে থাকে। তবে উন্নয়নতত্ত্ববিদদের কেউ কেউ এমন তত্ত্বও তুলে ধরেছেন যে, উন্নয়ন কৌশলে নগরের প্রতি পক্ষপাত করার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দারিদ্র্য অব্যাহত থাকে (Lipton, 1977)। শিক্ষার সুযোগ ও মানের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্য গ্রাম-শহরের উন্নয়নে বৈষম্য সৃষ্টি করার একটি বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এই বিষয়টি মনোযোগ দাবি করে।

বাংলাদেশে গত তিন দশক ধরে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে সচেতনভাবে। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে এবং সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা শহর-গ্রামে সব স্কুলেই সমানভাবে পাওয়ার কথা। সাম্প্রতিককালে গ্রামেও শহরাঞ্চলের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য নীতিমালা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার অর্জন ও ভর্তি হারে শহর ও গ্রামের মধ্যে কী ধরনের পার্থক্য রয়েছে সে বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া হলো সারণি ৯-এ।

সারণি ৯: গ্রাম ও শহরে শিক্ষার্জনের পার্থক্য

শিক্ষাস্তর	পাঁচ বছর ও তদূর্ধ্বদের কত শতাংশের এই স্তরের অর্জন		
	গ্রাম	শহর	গ্রাম ও শহর
কোনো শিক্ষা নেই	৩৪.৪	২১.৪	৩০.৬
প্রাইমারি পর্যন্ত	২৩.১	২০.৪	২২.৩
মাধ্যমিক পর্যন্ত	৩৩.৪	৩৮.৩	৩৫.০
উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত	৬.০	১১.১	৭.৫
স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	২.৩	৮.৬	৪.২
অন্যান্য	০.৫	০.২	০.৪
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭।

সারণি ৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, শহরের তুলনায় গ্রামে শিক্ষিতদের অংশ অনেক কম। এই পার্থক্য সবচেয়ে প্রকট স্নাতক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে। অবশ্য এই পার্থক্য ভবিষ্যতে কমে আসবে আশা করা যায় কারণ ১৫ ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের শিক্ষায়তনে ভর্তি হারে শহর-গ্রামের পার্থক্য খুব বেশি নয় (সারণি ১০)। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিরাজ করছে, কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে পার্থক্য নেই। অর্থাৎ গ্রামের এই বয়সের মেয়েদের ভর্তি হতে এবং শিক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত করার দিকে মনোযোগী হতে হবে।

সারণি ১০: ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের ভর্তিহারে গ্রাম ও শহরের পার্থক্য

লিঙ্গ	গ্রাম/শহর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত কিনা	
		হ্যাঁ	না
নারী	গ্রাম	৮.৮	৯১.২
	শহর	১১.৫	৮৮.৫
	মোট	৯.৬	৯০.৪
পুরুষ	গ্রাম	১২.৬	৮৭.৪
	শহর	১২.৬	৮৭.৪
	মোট	১২.৬	৮৯.৪
নারী ও	গ্রাম	১০.৭	৮৯.৩
পুরুষ মোট	শহর	১২.১	৮৭.৯
	মোট	১১.১	৮৮.৯

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-২০১৭।

শিক্ষাতে গ্রাম-শহরের পার্থক্য শুধু ভর্তিহারে নয়, শিক্ষার প্রকৃত অর্জনের দিক থেকেও এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। যেমন ১৯৯৯ সালের এডুকেশন ওয়াচ থেকে প্রাপ্ত তথ্য শহর-গ্রামের বড় পার্থক্য দেখায় (সারণি ১১)। এই পার্থক্য ২০০৮ এর জরিপেও দেখা গিয়েছে (CAMPE, 2005, 2008)।

সারণি ১১: মৌলিক শিক্ষার অর্জনে ১১-১২ বছর বয়সীদের শহর-গ্রামে পার্থক্য ক্ষেত্রে

গ্রাম/শহর	শতকরা কত ভাগ ছেলেমেয়ের অর্জন সন্তোষজনক		
	ছেলে	মেয়ে	ছেলে ও মেয়ে একত্রে
গ্রাম	২৫.২	২৮.৮	২৬.৫
শহর	৪৪.২	৫২.৭	৪৮.৪

উৎস: Education Watch (2005).

শিক্ষা প্রসারে যেসব সমস্যার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার সাথে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়। সেটা হচ্ছে গত দুবছরের কোভিড এর যে নেতিবাচক অভিঘাত পড়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। এই অভিঘাত সারা পৃথিবীতেই, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেখা গিয়েছে। এই সময়ে বাংলাদেশে প্রায় দুবছর স্কুল বন্ধ ছিল; শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। একটু দেরিতে শুরু হলেও অনলাইন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। তবে তা স্বাভাবিক পাঠদানের সম্পূর্ণ বিকল্প হতে পারেনি। কাজেই এই বছরগুলোতে শিক্ষার মানের আরও অবনতি হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্জনে বৈষম্য বৃদ্ধি ঘটেছে নানা কারণে। ইন্টারনেট সংযোগে পিছিয়ে থাকা গ্রামাঞ্চলে ও দূরবর্তী এলাকাতে ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। যথোপযুক্ত ফোন, টিভি বা মাধ্যমের অভাবে নিম্ন-আয়-পরিবারের ছেলেমেয়েরা বঞ্চিত হয়েছে এসব ইন্টারনেটভিত্তিক শিক্ষাক্রম থেকে।

এই সময়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর আয় হ্রাস পেয়েছে, কাজেই শিক্ষাতে পিছিয়ে পড়া রোধে তারা ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগের ব্যয় বহন করবে এটা প্রত্যাশা করা যায় না। বরং আয় বৃদ্ধির আপ্রাণ প্রচেষ্টাতে তারা কৌশল হিসেবে স্কুলপড়ুয়া ছেলেদের উপার্জন কাজে লাগিয়ে দিতে প্রয়াস নিয়েছে। ব্যয় হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কিশোরী কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করলে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। এই প্রক্রিয়াগুলো শুধু বাংলাদেশে নয়, অন্যান্য দেশেও ঘটেছে।

কোভিডের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে কর্মসংস্থানের গতি ও তার মান নিম্নগামী হচ্ছে। যেসব কারণে এটা ঘটতে পারে তার আলোচনা রয়েছে (রহমান ও অন্যান্য, ২০২২) অন্যত্র। এই একই গ্রন্থে দেখা গিয়েছে যে, কোভিড ও এর প্রতিকারার্থে যে 'লক-ডাউন', বিধিনিষেধ দেওয়া হয়েছিল তাতে শুধু সেই সময়ে নয়, পরবর্তী বছর ধরেই বেকারত্ব বেড়েছে।

এই নেতিবাচক প্রভাব মধ্যমেয়াদে এমনকি দীর্ঘমেয়াদেও অনুভূত হতে পারে, যদি তার প্রতিকার করার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া না হয়। কর্মসংস্থানের গতি ও মান হ্রাসের সাথে কার্যকর থাকবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাতে যে ক্ষতি হয়েছে তার প্রভাব। শ্রমবাজারের পরিস্থিতি সরাসরি উন্নত করার পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের জন্য দুরূহ। বরং শিক্ষার ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করাটাই এখন যথাযথ পদক্ষেপ হতে পারে।

৬। বেকারত্ব ও শিক্ষা

শিক্ষিত জনশক্তি বিশেষ করে স্নাতক শিক্ষিতরা যদি শিক্ষা সমাপনের পর বেকার সময় অতিবাহিত করে তাহলে একদিকে তারা উপার্জন থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে দেশের জন্য এটা শিক্ষিত জনশক্তির অপচয়। এই দুই দিক বিবেচনা করেই শিক্ষা ও বেকারত্বের সম্পর্ক এবং শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব হারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করা জরুরি।

এই আলোচনাতে যাওয়ার আগে বেকারত্বের সংজ্ঞা বিষয়টির পর্যালোচনা প্রয়োজন। বেকারত্ব বলতে সাধারণত 'উন্মুক্ত বেকারত্ব' (open unemployment) নির্দেশ করা হয়। এটির একটি আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা আছে । তা হচ্ছে 'কোনো ব্যক্তি (শ্রমশক্তির বয়সী, যা বাংলাদেশে ১৫ বা তদূর্ধ্ব বছর') যদি উপার্জন কাজে নিয়োজিত না থাকে এবং উপার্জন করতে আগ্রহী হয় ও সেরকম কাজে অনুসন্ধান করে বা স্বনিয়োজিত হওয়ার চেষ্টাতে থাকে, তাহলে সে বেকার হিসেবে গণ্য হবে।' এই সংজ্ঞাটি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে। যেমন, এদেশে অনেকেই নিজেকে বেকার হিসেবে চিহ্নিত করতে চায় না। একেবারে নিম্ন আয়ের পরিবারে উপার্জন কাজ অনুসন্ধান করার সাথে সাথে অনেকেই কিছু না কিছু শ্রমঘণ্টা সামান্য আয় হলেও সেখানে নিয়োজিত থাকে, যার ফলে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বেকারত্ব হার এদেশে কম হয় (Rahman, 2016)। উপার্জন কাজ করতে চাইলেও অনেকেই সেরকম নিয়মমাফিক কর্ম অনুসন্ধান করে না। তবে এ সমস্যা শিক্ষিতদের মধ্যে কম হবে।

শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব হারের প্রবণতা পর্যালোচনা করা হবে শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে। উপরে যেহেতু সংজ্ঞা বিষয়ক সমস্যা আলোচনা করেছি, সেহেতু এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সেই সমস্যা সব জরিপে একই রকম হওয়াটাই স্বাভাবিক এবং বিভিন্ন সময়ের তুলনা করাটা সমীচীন হবে। সারণি ১২ দেখাচ্ছে, চারটি শিক্ষাস্তর ভেদে বেকারত্ব হারের তুলনা এবং ২০০০ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে তার পরিবর্তন।

সারণি ১২: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বেকারত্ব হার (%): ২০০০ থেকে ২০১৭

শিক্ষাস্তর	২০১৭	২০১৬	২০১০	২০০৬	২০০০
কোনো শিক্ষা নেই	১.৫	২.২	২.৮	২.৮	১.৪
প্রাইমারি পর্যন্ত	২.৭	২.৫	৩.৮	-	-
এসএসসি থেকে এইচএসসি	৬.৪	৬.২	৯.৭	৮.৭	১১.৫
স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	১১.২	৯.০	৫.০	৬.২	৭.৮
সব শিক্ষাস্তর	৪.২	৪.২	৪.৫	৪.৩	৪.২

উৎস: বিবিএস: শ্রমশক্তি জরিপ রিপোর্ট (বিভিন্ন বছর)।

লক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে: শ্রমশক্তির যে অংশের কোনো শিক্ষা নেই বা প্রাইমারি পর্যন্ত শিক্ষা তাদের মধ্যে বেকারত্ব হার খুব কম। সব বছরেই তা ছিল শতকরা তিন এর নিচে (২০১০ এর প্রাইমারি ব্যতিক্রম)। অন্যদিকে এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে তা অনেক বেশি, শতকরা ৬ ভাগ থেকে শতকরা প্রায় ১২ ভাগ পর্যন্ত। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ২০১০ থেকে ২০১৭ সময়ে স্নাতক ও তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব হার বৃদ্ধি পেয়েছে দ্রুত।

শুধু তরুণ শ্রমশক্তি (১৫ বছর থেকে ২৯ বছর বয়সী) বিবেচনা করলে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব হার আরও উঁচু বিশেষত নারী শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে বলা যায়, এই সমস্যাটি বেশ গুরুতর এবং তার ফলে জাতীয় আয়ে শিক্ষার সম্ভাব্য অবদান অর্জিত হচ্ছে না। ভবিষ্যতে এটা উচ্চশিক্ষাতে ব্যক্তি বা পরিবারের বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করতে পারে। স্নাতক ও উচ্চতর শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান আরও কয়েকটি গবেষণাতে পাওয়া গিয়েছে। সেগুলোর পর্যালোচনা (রহমান ও অন্যান্য, ২০২২) থেকে দেখা যায়, বেকারত্ব হার ৩৫ থেকে ৪৬ শতাংশ।

শিক্ষিত তরুণ নারী শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় বেকারত্ব হার অনেক বেশি (Rahman & Islam, 2019)। সুতরাং নারীর উচ্চ শিক্ষার জন্য পারিবারিক আগ্রহ ও বিনিয়োগ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কাটি প্রবল। এখানে স্মর্তব্য যে, পুরুষদের তুলনায় উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে নারীর অর্জন অনেক কম। কাজেই শিক্ষিত বেকারত্ব এবং তা বৃদ্ধির আশঙ্কাজনক প্রবণতাটিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সমাধানের জন্য সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা গ্রহণের বিকল্প নেই।

৭। উপসংহার ও ভবিষ্যতের জন্য দিকনির্দেশনা

গত তিন দশক ধরেই বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। উপরের আলোচনা থেকে বিশেষ কিছু সুনির্দিষ্ট দিকে এই প্রভাব সুস্পষ্ট হয়েছে। একটি জাতির অগ্রগতিতে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। তা সত্ত্বেও তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনার মাধ্যমে সেটা আরও জোরালো হয়।

সংক্ষেপে মূল উপসংহারগুলো এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

ক) শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে শ্রমশক্তিতে শিক্ষিতদের অংশ বাড়ছে। একই সাথে কোনো শিক্ষা নেই এমন অংশ কমেছে। তবে উচ্চ শিক্ষিতদের (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) অংশের বৃদ্ধি এখনো কম।

খ) শিক্ষার ফলে শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা বেড়েছে যা প্রতিফলিত হয়েছে তাদের মজুরি/বেতন থেকে উপার্জন বৃদ্ধিতে। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় শিক্ষা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

গ) শিক্ষা দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সময়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রণীত কয়েকটি গবেষণাতে দেখা গিয়েছে যে, খানা প্রধানের শিক্ষা অর্জন উচ্চতর হলে তাদের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাব্যতা হ্রাস পায়। তিন সময়ের খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকেও দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষা দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে।

ঘ) এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণে কিছু আশঙ্কাজনক বিষয় উন্মোচিত হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ করা উচিত, দারিদ্র্য হ্রাসে শিক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা ক্রমে দুর্বল হয়ে আসার চিত্র ফুটে উঠেছে। বিগত কয়েকটি আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে, স্নাতক বা তদূর্ধ্ব শিক্ষিতদের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের হার শ্লথ হচ্ছে। তার বিপরীত চিত্র কোনো শিক্ষা নেই তাদের ক্ষেত্রে। তেমন পরিবারগুলোতে দারিদ্র্য হ্রাসের হার দ্রুততর হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে একদিকে শিক্ষার মানের অবনতি ও দরিদ্র পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার নিম্নমান এবং অন্যদিকে শিক্ষিতদের বেকারত্ব বা নিম্নমানের কর্মসংস্থান।

ঙ) আরও একটি আশঙ্কাজনক দিক হচ্ছে, শিক্ষার সুযোগের ক্ষেত্রে বেশ গুরুতর বৈষম্য বিরাজ করছে। নিম্ন আয়ের পরিবারে উচ্চতর আয়ের পরিবারগুলোর তুলনায় ভর্তিহার কম। এই পার্থক্য উচ্চ মাধ্যমিক বা তদূর্ধ্ব স্তরে শিক্ষার উপযোগী বয়সীদের ক্ষেত্রে প্রাইমারি পাঠের বয়সীদের তুলনায় বেশি। গ্রামের ক্ষেত্রে ভর্তিহার শহরের তুলনায় কম, ১২ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সীদের বিবেচনা করা হলে। শিক্ষার প্রকৃত অর্জনের ক্ষেত্রেও গ্রাম ও শহরের মধ্যে প্রকট বৈষম্য রয়েছে। তবে শিক্ষার অর্জন সামগ্রিকভাবেই প্রত্যাশার তুলনায় কম।

চ) সবশেষে উল্লেখ করা উচিত যে, স্নাতক বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা বাড়াতে এবং আধুনিক খাতগুলোতে কর্মসংস্থানের অংশ বাড়ানোতে। এই সম্ভাবনাগুলো ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা যায়।

উপরে উল্লিখিত শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাব এবং এই ইতিবাচক দিকগুলো কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা থেকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সাধারণ দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

শিক্ষার প্রসারের জন্য মনোযোগী হতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে ভর্তিহার বাড়ানোতে। এসব ভর্তিহারে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস করার জন্য বাস্তবসম্মত লক্ষ্যভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

শিক্ষার প্রসারকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাস ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষিতদের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে দ্রুত হারে। সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সুপারিশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে অন্যত্র (রহমান ও অন্যান্য, ২০২২; Rahman, 2016)। সংক্ষেপে এটুকু বলা যায়, এজন্য প্রয়োজন শ্রমনিবিড় শিল্প ও সেবাখাতের প্রসার। আর শিক্ষিতদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার মান এবং শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রকৃত শিক্ষার্জন বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

উচ্চতর শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন আরও জরুরি হয়ে উঠেছে কারণ চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এখন দ্বারপ্রান্তে। যেখানে উচ্চ প্রযুক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা হবে গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে যুগান্তকারী উন্নয়ন অর্জনের জন্য বাংলাদেশকেও তৈরি করতে হবে শিক্ষিত ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি।

নীতির বিষয়ে দিক নির্দেশনাতে আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোতে (SDG) শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। তবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ভর্তিহারকেই স্থান দেওয়া হয়েছিল। সেদিক থেকে বাংলাদেশ সেসব লক্ষ্যমাত্রা ভালোভাবেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে সেখানে ঝরে পড়া, শিক্ষা সমাপন, শিক্ষার মান এসব বিষয় আসেনি।

এসডিজি (SDG) তাই জোর দিয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপনের ওপর। সেইসাথে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্যহীন অগ্রগতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সব ছেলেমেয়ে বিনা খরচে বৈষম্যহীনভাবে মানসম্মত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করবে যাতে প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত হয়। এই লক্ষ্যটি অর্জন করার জন্য একদিকে সবাইকে সেই পর্যায়ের পড়াশুনা শেষ করতে হবে, অন্যদিকে শিক্ষার প্রকৃত অর্জন যথেষ্ট হতে হবে। প্রাসঙ্গিক ও কার্যকর হওয়ার জন্য শিক্ষার মানোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

তবে বৈষম্যহীনভাবে শিক্ষার্জন বাড়াতে হলে কম আয়ের পরিবারগুলোর দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি দুষ্টচক্র বিরাজ করে যেখানে স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা তথাকথিত ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়। ভালো ফল করে এবং তাদের ভালো আয়ের পথ সুগম হয়। তাতে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য, সব ছাত্রদের দিকে মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকের সুপ্ত প্রতিভা ও ক্ষমতাকে বিকশিত করা সেটা অধরাই থেকে যায়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, তাদেরকে সম্মান ও আর্থিক সুবিধা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে দায়িত্বশীলতা বাড়ে আর সেই সাথে পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

রহমান, রুশিদান ইসলাম (২০১২)। *বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন, স্বাধীনতার পর চল্লিশ বছর*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

রহমান, রুশিদান ইসলাম, রিজওয়ানুল ইসলাম ও কাজী সাহাবউদ্দীন (২০২২)। *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা: সুবর্নজয়ন্তীতে ফিরে দেখা*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

Ahmad, N., & Joseph J. F. (2011). Decomposing the relationship between human capital and GDP: An empirical analysis of Bangladesh. *The Journal of Developing Areas, 44* (2), 127–42. http://www.jstor.org/stable/23215244.

Asadullah, M. N. (2005). *Returns to education in Bangladesh* (QEH Working Paper Series QEHWPS130). https://www.odid.ox.ac.uk/files/www3_docs/qehwps130.pdf

Banerjee, A. V., & Douflo, E. (2011). *Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty*. Public Affairs.

Bangladesh Bureau of Statistics. (various years). *Household income and expenditure survey*.

Bangladesh Bureau of Statistics. (various years). *Report of labour force survey*. Dhaka:BBS.

Barro, R. J. (1991): Economic growth in a cross section of countries. *The Quarterly Journal of Economics, 6*(2), 407-443

Barros, A. R. (1993). Some implications of new growth theory for economic development. *Journal of International Development, 5*(5).

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with Special reference to education.* second edition. New York: National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press.

CAMPE (2005, 2008). *Education watch, the state of secondary education. Progress and challenges*. Dhaka, Bangladesh: CAMPE.

Hamishek, E. & Woessmann, L. (2010). *Education and economic growth:* In: *Economics of education*. Amsterdam: Elsevier.

Islam, T. S., Wadud, M. A., & Islam., Q. B. T. (2007). Relationship between education and GDP growth: A multivariate causality analysis for Bangladesh. *Economics Bulletin, 3*(35),1-7.

Lipton, M. (1978). *Why poor people stay poor: Urban bias in world development*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Marquez-Ramos, L. & Mourelle, E. (2019). Education and economic growth: An empirical analysis of nonlinearities. *Applied Economic Analysis, 27*(79), 21-45. https://doi.org/10.1108/AEA-06-2019-0005

Mincer, J. (1981). Human capital and economic growth (NBER Working Paper No. w0803). https://ssrn.com/abstract=256899

Odit, M. P., Dooklaan, K., & Fauzel, S. (2010). The impact of education on economic growth: The case of Mauritius. *International Business & Economics Research Journal, 9* (8).

Osmani, S. R., & Latif, M. A. (2013). The pattern and determinants of poverty in rural Bangladesh: 2000-2010. *The Bangladesh Development Studies, 3*6(2).

Rahman, R. I. (2020). *Strategy for Job creation in the eighth five year plan in the context of fourth industrial revolution*. Planning Commission, Dhaka.

Rahman, R. I. (2016). *Growth, employment and social change in Bangladesh*. Dhaka: UPL.

Rahman, R. I. (2007). *Labour market in Bangladesh: Changes, inequities and challenges*. Research Monograph 21. Dhaka: BIDS.

Rahman, R. I. (2006). Access to education and employment: Implications for poverty. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) Dhaka, Bangladesh Programme for Research on Chronic Poverty in Bangladesh (PRCPB), Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and Chronic Poverty Research Centre (CPRC), Institute for Development Policy and Management (IDPM), University of Manchester February 2006, https://core.ac.uk/ download/pdf/268106481.pdf

Rahman, R. I. & Islam, R. (2019). *Employment, labour force participation and education: Towards gender equality in Bangladesh*. Dhaka: Centre for Development and Employment Research (CDER) and Friedrich Ebert Stiftung Bangladesh Office.

Rahman, R. I. & Islam, K. M. Nabiul. (2003). Employment Poverty Linkage, Bangladesh. *Issues in Employment and Poverty Discussion Paper 10*. ILO, Geneva.

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98* (5) Part 2, 571-5102.

Sen, B. (2019). Rural transformation, occupational choice and poverty reduction in Bangladesh during 2010-2016. *Bangladesh Development Studies* 42 (2 & 3).

World Bank. (2019). *Bangladesh poverty assessment, facing old and new frontiers of poverty reduction.* Washington D.C.

World Bank. (2008). *Poverty assessment in Bangladesh (Report No. 44321-BD).*

পরিশিষ্ট

সারণি ১: আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অংশ (শতকরা)

মোট কর্মসংস্থানের অংশ		
সাল	আনুষ্ঠানিক	অনানুষ্ঠানিক
২০০০	২৪.৭	৭৫.৩
২০০৩	২০.৮	৮৯.২
২০০৬	২১.৫	৭৮.৫
২০১০	১২.৫	৮৭.৫
২০১৩	১৩.৬	৮৭.৪
২০১৭	১৪.৯	৮৫.১

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন বছর।

সারণি ২: শিক্ষাস্তর অনুযায়ী তরুণ শ্রমশক্তির (১৫ থেকে ২৯ বছর) বেকারত্ব হার (শতকরা): ২০১০ থেকে ২০১৭

শিক্ষাস্তর	২০১৭		২০১৬		২০১০	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
কোনো শিক্ষা নেই	১.০	২.৫	১.৩	৩.৯	৩.৩	৬.১
প্রাথমিক পর্যন্ত	১.৮	৪.৮	১.৪	৫.২	৭.৪	৮.১
এসএসসি	৩.২	৭.৪	৪.৮	৯.৭	১৫.৪	১৩.৯
এইচএসসি	১১.১	২৬.২				
স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	৮.৩	২১.৪	৬.৯	১৬.৮	৭.৬	১৫.৪
সব শিক্ষাস্তর	৩.১	৬.৭	৩.০	৬.৮	৬.৮	৮.৫

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, বিভিন্ন বছর।

সারণি ৩: নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের নিয়ামক: লজিট সমীকরণের (নির্ভরশীল চলক: নারীর শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের সম্ভাব্যতা)

স্বাধীন চলক	Coef.	z-value	marginal effect
নারীর বয়স	০.১৭৩	১১৩৯.৯২	০.০৩৮৪
নারীর বয়সের বর্গ	-০.০০২	-১২৮৫.২৭	-০.০০০৫
তিনি কি খানাপ্রধান (হা=১)	১.৩১৬	২৮১.৬৬	০.৩১৫৬*
পুরুষ খানাপ্রধানের বয়স	-০.০০৯	-১০২.৩৭	-০.০০২১
পুরুষ খানাপ্রধানের শিক্ষা	-০.০২৪	-৮৯.২৪	-০.০০৫৪
খানা সদস্য সংখ্যা	-০.০১৮	-৯৫.৪৮	-০.০০৪০
শিশুর সংখ্যা	-০.০৬৬	-১২৬.৩৩	-০.০১৪৭

(চলমান সারণি ৩)

স্বাধীন চলক	Coef.	z-value	marginal effect
শিক্ষা-প্রাথমিক পর্যন্ত	-০.০৯৪	-১০০.৮৫	-০.০২০৭*
শিক্ষা- মাধ্যমিক পর্যন্ত	-০.২৮১	-৩২৭.১৪	-০.০৬১০*
শিক্ষা- এসএসসি	-০.৫৯৯	-৪৮২.৫০	-০.১২০৮*
শিক্ষা- এইচএসসি	-০.২৪৯	-১৭১.০৩	-০.০৫৩১*
শিক্ষা- স্নাতক ও তদূর্ধ্ব	০.৬৭৯	৩৫৭.৩৭	০.১৬২৭*
প্রবাসী আয় পায় কি (হ্যাঁ-১)	-০.৭০০	-৫৪৭.৪০	-০.১৩৮৫*
অবিবাহিত	-০.২০০	-১৪৯.৯৬	-০.০৪৩৩*
গ্রামের	০.৪১২	৫৭৫.৮৭	০.০৮৮৬*
জমি ছোট	০.১১৩	১৭৪.৬০	০.০২৫৩*
জমি মাঝারি	০.০৯৫	৬৪.০৮	০.০২১৪*
জমি বড়	-০.০৫১	-১৪.৩১	-০.০১১৩*
ধর্ম ইসলাম	-০.১৪১	-১৩৩.৬০	-০.০৩১৮*
বরিশাল	-০.৩৬৯	-২৩১.১৫	-০.০৭৬৯*
চট্টগ্রাম	০.১৮৯	১৬৩.১৭	০.০৪২৬*
ঢাকা	-০.০৫০	-৪৮.৩৮	-০.০১১১*
রাজশাহী	০.৬১৭	৫২৪.৬০	০.১৪৫১*
রংপুর	০.০৮১	৬৫.৯৬	০.০১৮২*
সিলেট	-০.৭১১	-৪৩০.৭৫	-০.১৩৮৮*
স্থির সংখ্যা	-৩.২৪৬	-৯৪৯.৮২	
Pseudo r-squared	0.095	Number of obs	170530.00
Chi-square	6816310.208	Prob> chi2	0.000

টীকা: *** p<0.01, **p<0.05, *p<0.1

উৎস: Rahman & Islam (2019)